যুদ্ধাপরাধের বিচার

স্বাধীনতা মানি গণহত্যা মানি না?

ফারুক ওয়াসিফ

গত কয়েকশ বছরে বাংলা দিয়েছে যত পেয়েছে অনেক কম। কেবল বাংলা বললে হয় না, পূর্ব বাংলা বললে তবে সহি-শুদ্ধ হয়। দুনিয়ার মধ্যে এমন জাতি নাই, যাদের ওপর অল্পতম সময়ে এরকম সর্বোচ্চতম গণহত্যা হয়েছে। ১৯৭১-এর নয়টি মাস দিনে গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার করে মানুষ হত্যা চলেছে (১৯৮১ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা)। কিন্তু এর প্রতিদান বাংলার জনগণ পাননি। বাংলার স্বাধীনতা তাদের দুর্দশা ও ক্ষমতাহীনতা থেকে মুক্তি দেয়নি। যে দেশের জন্য তারা যুদ্ধ করেছে জীবন দিয়েছে, কেবল দেশটুকু ছাড়া আজ তাদের আর কিছুই নাই। এমনকি বেশিরভাগের জন্যও কবরের জমিনটুকুও বরাদ্দ নাই।

আমরা ভুলে যাই আমাদের কাঁধে ৩০ লাখ লাশের ভার। আনুমানিক ৪ লাখ নারীর চূড়ান্ত নিপীড়নের প্রতিকারের দায় আমাদের ওপর। এত মৃত্যু এত নির্যাতনের ভার নিয়ে খুব কম দেশকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে।

'৭১-এ আমাদের ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে তা কি কেবলই গণহত্যা? কেবল মৃত্যুই দেখেনি বাংলাদেশ, ধ্বংস দেখেছে, নিকৃষ্টতম ঘৃণা দেখেছে। এমন ঘৃণা যা বৃটিশরাও কখনো করার সাহস করেনি। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাপতিরা করেছে, তাদের পালিত রাজনীতিবিদ ভুট্টো গংরা করেছে। কী বিস্ময়, এত ঘৃণা সয়েও নিয়েও আমরা একত্রে ঘর করেছি ২৪ টি বছর। বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ম্যাসাকার' এর লেখক রবার্ট পেইন দেখাচ্ছেন যে, ''ইহাহিয়া বলেছেন, 'তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করো, তারপর দেখ, তারা আমাদের হাত থেকে খাবার নিয়ে খাবে'। এক পাকিস্তানী মেজর বলছে, 'আমরা চাইলে যে কাউকেই হত্যা করতে পারি, কারো কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না'।''

ঘাতক দলপতি এবং তার অনুচর উভয়ের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। না পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা না তাদের এদেশীয় দোসর– কারোরই শাস্তি হয়নি।

বলা হয়েছিল, ঘাতক-দালালদের বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হবে, কাউকেই ক্ষমা করা হবে না। সাগর পাড়ের দেশ হয়েও বাঙালি সাগরে ভয় পায়। নদী-নালা আর বন্যায় ভাসা তার মজ্জাগত অভ্যাস। সেকারণে শোকের নদীতে ভাসা আর অশ্রুর বন্যায় প্লাবিত হওয়াই বোধহয় আমাদের রীতি। শোককে ক্রোধে পরিণত করতে না পেরে আমরা এখন শোকের কারণটাকেই ভুলতে বসেছি। এতবড় একটা যুদ্ধ জাতি করলো, তারপরও কেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বীর রসের কথা নাই! বীর রসে সঞ্জিত গল্প, কবিতা, গান, নাটক বা উপন্যাস কেন এতো হাতে গোণা? কেন আমাদের দেশাত্মবোধক ভাবের বেশিরভাগটাই পুতুপুতু আবেগে জবজবা? দেশটা কি ময়রার ভিয়েন, যে সবকিছুই মিস্টির শিরায় চোবানো?

অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বাদ রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদন করতে আমাদের দেশের ভাল-থাকা অংশ কিন্তু কখনোই বিরত হন নাই। গোটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে দিগম্বর করে রেখে তারা একাই স্বাধীনতার সুখ ভোগ করে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই, কোনো খামতি নেই। রাষ্ট্র ও সমাজকে দুইয়ে, চুষে, চিবিয়ে ছোবড়া করে করেই তাদের নির্লজ্জ প্রতিষ্ঠা। এরা যেমন এদের রাজনীতিটাও তেমন। দক্ষ বিউটিশিয়ানের মতো এরা স্বাধীনতার দেহ থেকে ৩০ লাখ মানুষের রক্তদাগ মুছে ফেলতে পেরেছে, শারীরীক ও মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হওয়া লাখ-লাখ নারীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে চেপে যাওয়া হয়েছে।

লুকিয়ে ফেলা হয়েছে পাকিস্তানী সেনা ও রাজাকারদের ধর্ষণের ফসল যুদ্ধশিশুদের অস্তিত্ব। সেইসব মা ও তাদের সন্তানদের পরিণতির কোনো খোঁজ কি আমরা রেখেছি? এসব এখন কিছু লেখক-গবেষক আর মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের বিষয়। আজো রাষ্ট্রীয় এজেন্ডাভুক্ত হয়নি '৭১-এ সংঘটিত গণহত্যা, জাতিগত নিধন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আর যুদ্ধাপরাধের বিচারের জরুরত। আমাদের কত কত রাষ্ট্রীয় দিবস, কিন্তু ১৯৭১-এর নারকীয় গণহত্যার জন্য একটি 'গণহত্যা দিবস'ও আজতক ঘোষিত হয়নি। এমনকি এ গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক আদালতে প্রমাণ করতে গেলে যে ধরনের পদ্ধতিগত তদন্ত দরকার, তাও সমাধা করা হয়নি। হত্যা-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ হয়েছে, কিন্তু তার চরিত্রটা যে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ তা প্রমাণের উপযুক্ত আইনী ভাষা কি আমাদের আছে? দেশীয় দালালদের বিচারের উপযোগী ১৯৭২-এর দালাল আইনটিও জিয়াউর রহমানের আমলে রদ করা হয়েছে।

'৭১ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। জনসংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে তার মধ্যে আড়াই কোটি মানুষ এখনও বেঁচে আছেন। সুতরাং সাক্ষিদের মৃত্যু ঘটা এবং দলিলপত্র সংরক্ষণে জাতীয় উদ্যোগের দূর্বলতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণহত্যার সাক্ষ্যপ্রমাণও আজ হারিয়ে যাচ্ছে। এতে করে '৭১ এ পাকিস্তানি বর্বরতায় নিহতদের সংখ্যা নিয়ে কুতর্ক ও সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ তৈরি থাকছে। বাহুল্য হলেও বলা দরকার, সে সুযোগ হাতানোর লোকের অভাব বাংলাদেশে কখনই হবে না। সত্য এই যে, আমরা স্বাধীনতা মানি কিন্তু গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ আর চূড়ান্ত অমানবিকতাকে স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে মান্য করি না। বাংলাদেশ তো ভারতের মতো গণআন্দোলনের পথে আপসে স্বাধীনতা অর্জন করে নাই। স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশকে চূড়ান্ত পর্যন্ত যেতে হয়েছে। সেকারণে স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় গণআন্দোলন থেকে সশস্ত্র যুদ্ধে রক্তসাগর পাড়ি দেয়াও স্বাধীনতার ইতিহাসের অনিবার্য অংশ। এটা মানলে অপরাধীদের বিচারের দায় এড়িয়ে স্বাধীনতাকে হালাল ভাবতে অসুবিধা হবার কথা। টিকটিকি যেমন বিপদে পড়লে শত্রুর হাতে লেজ ফেলে দেহ নিয়ে পালায়, তেমনি আমাদের শাসকরা স্বাধীনতার দেহ থেকে গণহত্যাকে কেটে গদি মাথায় করে পালিয়েছে। এ কারণেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ অসমাপ্ত।

আমাদের শাসকদের সকল কিসিমের জাতীয়তাবাদই স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন করে, কিন্তু গণদুর্ভোগের বিচারের প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়, ভুলিয়ে দেয়। আপস করে ঘাতকের সঙ্গে। বিষয়টি যদি অতীতেরই হতো, তবে '৭১-এর যেসব গণবিরোধী শক্তি ও মতবাদের কবর রচিত হওয়ার কথা, তারা আগের থেকে বেশি শক্তিতে ফেরত আসতে পারতো না। এ সত্য থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা কেবল আত্মপ্রতারণাই নয়, সুবিধাবাদিতা। এটাই সত্যের ভেতরকার তিতা শাঁস। চাই কি না চাই, সত্যের আঁটি তিতাই হয় এবং তাতে কখনো কখনো জিভ ঠেকাতে হয়।

এখানেই মুক্তিযুদ্ধের শ্রেণীগত বিচারের প্রয়োজন পড়ে। মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজস্ব রাষ্ট্র চেয়েছে, চেয়েছে বিদেশী শাসক হটিয়ে ক্ষমতার গদিতে নিজেরা বসতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'বার বার জয়ী হয়েও আমরা গদীতে বসতে পারি নাই'। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত বাঙালিরা গদীতে বসতে চেয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। তাদের এই শ্রেণীগত আকাঙ্ক্ষা তখন ইতিহাসের ফেরে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাও হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্য যতটা পাক্কা ছিল, ক্ষমতার চরিত্র বদল ততটা ছিল না। কিন্তু কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ চেয়েছিল মুক্তি। সেই মুক্তির চেহারা-ছবি তাদের কাছে অস্পষ্ট হলেও, জমি-জীবন ও ভবিষ্যতের ওপর তারা বাঙালি বা অবাঙালি কারো আধিপত্য চায়নি। মুক্তিবাহিনীতে দলে দলে এরাই যোগ দিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধার প্রতীক

হিসাবে আমরা লুঙ্গি-গামছা পড়া কৃষককেই বুঝে থাকি। পাকিস্তানীদের গণহত্যার নিশানায় এরাই বেশি করে পড়েছিল। যে চার লাখ 'বীরাঙ্গনার' কথা বলা হয়, তারাও কিন্তু গ্রাম শহরের গরিব ঘরেরই নারী। স্বাধীন বাংলাদেশে এদের অবদান স্বীকার করা হয় কিন্তু ঊননজরে। মুক্ত বাংলাদেশ এদের ভুলে গেল। এরা অস্ত্রসমর্পণ করে ফিরে গেল, দেশ গড়া ও রাষ্ট্র পরিচালনার ডাক এদের কাছে এল না। এমনকি যে সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়া হলো, তাদের মধ্যে কৃষক সন্তানেরা থাকলেও সেই পরিচয়ের জন্য তারা সম্মানিত হননি, হয়েছেন সেনাসদস্য হওয়ার জোরে। নইলে সেনাসদস্যের বাইরের বীরদেরও আমরা দেখতে পেতাম। গণযুদ্ধের প্রয়োজনে শ্রেণীতে শ্রেণীতে মৈত্রীর ভিত্তিতে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, যা ছিল এ ভূখণ্ডের ইতিহাসে সবচয়ে বৃহত ঐক্য, স্বাধীনতার পরপরই তা ভেঙ্গে গেল। রাষ্ট্র একদিকে চলে গেল, সমাজ আরেকদিকে। অন্যদিকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে রুখতে সফল হলেও নিজ জাতির মধ্যকার ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজিত হলো। একই কারণে পরাস্থ হলো তাদের শ্রেণীর লাখ-লাখ মানুষ-হত্যার বিচারের দাবি। গত ৩৫ বছরে যারা ক্ষমতাবান হয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে তাদের তো খুব বেশি কিছু হারাতে হয়নি। বড় যুদ্ধের ভেতরে যে ছোট ছোট গোষ্ঠীগত যুদ্ধ চলে তার চরিত্র নিরূপণ এবং তাতে কার কী ভূমিকা তা সনাক্ত করা ছাড়া তাই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কী থেকে কী হয়ে গেল তার কার্যকারণ স্পষ্ট হয় না। ১৬ ডিসেম্বর তাই একইসঙ্গে জয়-পরাজয়ের দিন। আমরা জয়ী হলাম, কিন্তু আমাদের একটা অংশ সেই জয়ের স্বাদ পেল না। বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লব প্রথমেই তার সন্তানদের খায়। তাই-তো '৭৫ সালের মধ্যেই দেখা গেল শেখ মুজিবসহ চার নেতা নিহত হলেন। সিরাজ শিকদার নিহত হলেন, জাসদের গণবিপ্লবে অনেক তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অকাল মৃত্যু ঘটলো। সবই কিন্তু হয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার ভেতর থেকে, বাইরের বিদ্রোহ বা আক্রমণে নয়। এটা একটা দিক। অন্য দিকটি হলো, লড়াই ও ত্যাগের অগ্রভাগে যে শ্রেণীটি ছিল তাদের পশ্চাদপসরণ। পরবর্তী শাসকেরা চেষ্টা করেছে গরিব জনগোষ্ঠীর শ্রেণীগত পরাজয়ের এই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেয়ার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষপূজকরাই এ ব্যাপারে শিরোমণি। বঞ্চিত জনগণকে যদি তাদের পরাজয়ের স্মৃতি ও জ্বালা ভুলিয়ে দেয়া যায়, তবে তারা কখনোই ক্ষমতা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে মাথা তুলবে না। গণহত্যার বিচার না হওয়ার সঙ্গে এই ভুলিয়ে দেয়ার রাজনীতির সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশে '৭১-এর গণহত্যার বিচারের দাবি যদি কখনো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, যদি সত্যিসত্যি গণশত্রুদের বিচারের মুখোমুখি করা সম্ভব হয়, তবে রাষ্ট্র ও সমাজের কোটরে বেড়ে ওঠা গোটা বিষবৃক্ষের ঝাড়ই আক্রান্ত হবে। যে অগণতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো ও দায়িত্বহীন রাজনীতির গাফিলতিতে তারা রক্ষা পেয়েছে ও পাচ্ছে, গণরোষের তীরের নিশানা থেকে তারাও রেহাই পাবেন না। সেটাই হবে অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব।

অতীতের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতীতের দ্বন্দ্ব যদি অতীতে মীমাংসা করা না হয় তবে তা ফিরে ফিরে আসবেই। শরীরের ক্ষত যদি না শুকায় তবে তা বারবার ব্যথা জাগাবেই। যতদিন না যার যা প্রাপ্য তা তাকে দেয়া হচ্ছে, ততদিন সেই কর্তব্য আমাদের তাড়িয়ে বেড়াবে। যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে অতীতের বোঝা আমরা ঝেড়ে ফেলে সামনে এগোতে পারবো না।